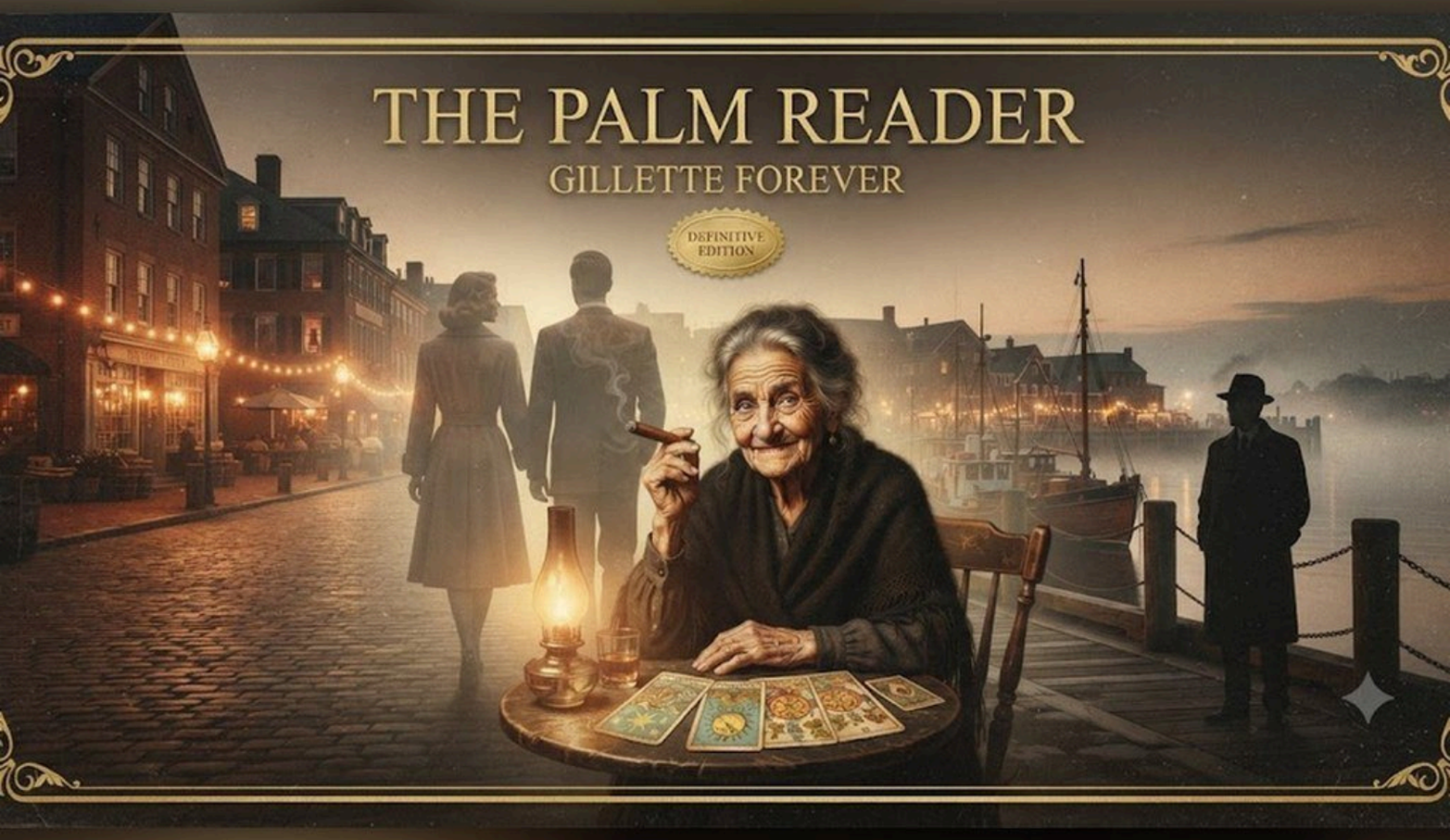

THE PALM READER
GILLETTE FOREVER
DEFINITIVE EDITION

Wall Street-এর হস্তরেখাবিদ — পরবর্তী পর্ব II

মায়ামিতে ফিরে যাওয়ার ছক আমি কষে ফেলেছিলাম।

ছ’মাস।

জিরিয়ে নেওয়ার, স্প্যানিশটা শানিয়ে নেওয়ার আর কিউবান নারীদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখার পক্ষে যথেষ্ট সময়।

ওরা বরাবরই ছিল আমার প্রিয় শিকার।

একটা সুপারমার্কেটে ঢুকলাম, আর নিয়তি পৌঁছে গেল ট্রলির আগেই।

আমার সামনে এক নারী এসে দাঁড়াল।

কিউবান।

আমি ওকে তক্ষুনি চিনলাম।
ও আমাকে চিনল।
কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।
তারপর বলল:

“তুমি এখানে কী ছাই করছ?”

“বাজার করছি।”

“না। মানে পৃথিবীতে। এতদিনে তো তোমার নরকে থাকার কথা, তাই না?”

আমি ওর ইংরেজির প্রশংসা করলাম।
নিখুঁত।
সেরা নারীরা সব সময় একসঙ্গে দুজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে:
মিষ্টি, যখন তথ্য চায়,
নির্মম, যখন তা পেয়ে গেছে।

ও জিজ্ঞেস করল আমি কেমন আছি।
শরীর কেমন।
আমি এখনও বেঁচেই বা আছি কী করে।

আমার স্ত্রী কোথায়।

আর, সবচেয়ে বড় কথা:

“তুমি তরুণ থেকে গেলে আর খোদ শয়তানকে হারালে কী করে?”

বললাম, আমাকে একটা বাস ধরতে হবে।

কথাটা সত্যি ছিল।

কোথাকার বাস, তা বলিনি।

বিদায় জানিয়ে উধাও হয়ে গেলাম।

. . .

বাড়ি ফিরে তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

স্বপ্নে দেখলাম, কেউ একজন ইতালিতে আমার বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠছে।

আমি তাকে চিনতাম।

কিংবা হয়তো চিনতাম না।

তারপর আচমকা মনে পড়ল।

এ তো সে-ই।

সিনসিনাটির সেই ভারতীয়।

সই করা ডলারের নোটওয়ালা লোকটা।

সে শেষ ধাপে পৌঁছোল।

আমাকে জড়িয়ে ধরল।

হাসল সেই ব্রিটিশ স্থৈর্য নিয়ে, যা কোনও কোনও ভারতীয়ের গায়ে খোদ ব্রিটিশদের চেয়েও ভালো মানায়।

তারপর আমার দিকে তাকাল, গম্ভীর মুখে।

“ফ্রেগা, দয়া করে বলুন — বাথরুমটা কোথায়?”

আমি চমকে জেগে উঠলাম।

বাথরুমের দরজা খুঁজতে গেলাম।

তারপর বুঝলাম, আমি এখনও স্বপ্নের ভেতরেই।

ঘুরে দাঁড়ালাম।

লাল আরামকেদারাটা দখল হয়ে আছে।

আবার সে।

বস্টনের ভূত।

হাসছে।

“জানতাম তুমি ভয় পাওনি। তুমি বিচিওয়ালা পুরুষ।”

তারপর সে পাশে থাকা একজনের দিকে আঙুল তুলল।

“দেখো কাকে এনেছি।”

. . .

এক লম্বা নারী।

রুচিশীল।

আমেরিকান।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

ভঙ্গিটা নির্বাহীর।

দৃষ্টিটা এমন কারও, যে সেই সব নথিতে সই করে যেগুলো অন্যদের জীবন শেষ করে দেয়।

সে হাত বাড়িয়ে দিল।

“কপিরাইট অফিস। ওয়াশিংটন ডি.সি.।”

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

“পদোন্নতিটা তো মারাত্মক। এখানে এসে পড়লে কী করে?”

“তোমার একটা ইমেল পেয়েছিলাম।”

“তারপর?”

“পড়লাম।”

“তারপর?”

“আমার হৃদয় সইতে পারল না।”

ভূতটা হো হো করে হেসে উঠল।

আমি হাসিনি।

“আমি দুঃখিত।”

“দুঃখিত হয়ো না।”

“না, সত্যি বলছি।”

“না, সত্যি বলছি — আমিও।”

. . .

সে বসল।

ঘরটা খুঁটিয়ে দেখল।

আমাকে খুঁটিয়ে দেখল।

তারপর বলল:

“তুমিই সেই পুরুষ, যার অপেক্ষায় আমি সারা জীবন ছিলাম।”

“কারও সঙ্গে দেখা করার পক্ষে ব্যবস্থাটা বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে।”

“এর চেয়ে ভালো কিছু আমি খুঁজে পাইনি।”

“না। বিশ্বাস করো। এটা সেরা ছিল না।”

সে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

তারপর আমি তাকে সেই একমাত্র প্রশ্নটা করলাম, যার দাম ছিল।

“কপিরাইট অফিসের আগে — কোথায় কাজ করতে?”

“একটা আমেরিকান বহুজাতিকে। ডিটারজেন্ট।”

“কেমন ছিল?”

“লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে হলে মরতে হয়।”

“মানে?”

“আক্ষরিক অর্থেই। তুমি ফেটে না পড়া পর্যন্ত ওরা তোমাকে খাটায়।”

. . .

আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর হাসলাম।

“আমি দুঃখিত, সোনা।”

“কীসের জন্য?”

“তুমি ভুল মাত্রাটা বেছে নিয়েছ।”

“কী বললে?”

“জীবনে ব্যাপারটা সব সময় — কেবল এবং কেবল — স্টাইলের।”

আমি জানলার দিকে আঙুল তুললাম।
পৃথিবীটা তখনও বাইরে পড়ে আছে।
বিভ্রান্ত।
সরব।
সমস্যায় ভরা।

“আমি সবার কথা শুনি।”

“ভূতদেরও?”

“বিশেষ করে ওদের।”

“তা হলে আমাদের সঙ্গে চলে আসছ না কেন?”

“কারণ এখানে, নিচে, আমার এখনও একটা কাজ শেষ করা বাকি।”

বস্টনের ভূত মাথা নেড়ে সায় দিল।
নির্বাহী চোখ নামিয়ে নিল।
তাকে হতাশ দেখাচ্ছিল।

. . .

আমি উঠে দাঁড়ালাম।
দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম।
তারপর ফিরে তাকালাম।

“ভালো কথা —”

“কী?”

“ঘটনাচক্রে আমিও ডিটারজেন্টেই আছি।”

“তো?”

“কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে আমি কারও মরার অপেক্ষায় থাকি না।”

ভূতটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

সে হাসল — এই প্রথমবার।

আবার যখন চোখ খুললাম, আমি একা।

ঘরে আর কেউ নেই।

ভূত নেই।

নির্বাহী নেই।

বাথরুম খুঁজে বেড়ানো ভারতীয় নেই।

শুধু লাল আরামকেদারাটা।

এখনও আমাকে দেখছে।

যেন আগে থেকেই জানে, পরের রাতে কে আসছে।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা